দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বৃহস্পতিবার ২ আশ্বিন ১৪১৬, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯
ব্যবসা

# জব সিকিউরিটি ঃ উন্নয়নের সহায়ক না অন্তরায়

ড. এম আজিজুর রহমান

সৃষ্টির সব জীবের ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা একটি অত্যাবশ্যক চাহিদা। মানুষের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন হয়। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মানুষ চাকরি ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা চায়। চাকরির নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা পেলে মানুষের কর্মদক্ষতা তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষ এই নিরাপত্তা বোধের অপব্যবহার করে। নিরাপত্তা বোধকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে মানুষ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে উদাসীন হয়। ফলে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং কর্মক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বলা যায়, চাকরিক্ষেত্রে নিরাপত্তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিক রয়েছে এবং এ দুটি দিকের ওপর আলোকপাত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রায় এক দশক পূর্বে বা ২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি, যার ৬ ভাগের ৫ ভাগ বা ৫০০ কোটি শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস করে। মাত্র ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি লোক বিশ্বের উন্নত দেশে বাস করে। উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার গড়পড়তা বৃদ্ধির হার শতকরা ০.১৭ ভাগ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড়পড়তা হার ৩ থেকে ৪ ভাগ। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ যেমন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যায়ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে শতকরা ১.৪৮ ভাগ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড়পড়তা হার শতকরা ১.৬। সাধারণত ১৫ বা তার নিচের বয়সের শিশুদের এবং ৬৫ বছরের উপরের বয়সের জ্যেষ্ঠদের নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৫ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গকে কর্মঠ গোত্রের পর্যায়ে ফেলা হয়, যদিও কর্মসংস্থানের অভাবে তাদের মধ্যে অনেককে বেকার থাকতে হয়। উন্নয়নশীল সবগুলো দেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের মতো এত বেশী নয়।

২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনে জনসংখ্যা ১২৬ কোটি ১ লাখ, ভারতে ১০১ কোটি ৬ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ২১ কোটি, ব্রাজিলে ১৭ কোটি, পাকিস্তানে ১৩ কোটি ৮ লাখ, বাংলাদেশ ১৩ কোটি ও নাইজেরিয়ায় ১২ কোটি ৭ লাখ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্ভরশীল জনসংখ্যা প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ আর উন্নত দেশগুলোতে নির্ভরশীল জনসংখ্যা প্রায় ২০ থেকে ৩০ ভাগ। বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার অপ্রত্যাশিতভাবে বেশী। এটা যদি ৪৫% হয়, তাহলে চলতি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের ভেতরে ৬ কোটি ৪৮ লাখ লোক নির্ভরশীল। বাকি ৭ কোটি ৯২ লাখ লোক কর্মঠ ব্যক্তির আওতায় পড়ে, যারা কাজ করতে চায় ও কাজের সন্ধান করে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশ বেকার সমস্যা নামক একটি জটিল সমস্যায় জর্জরিত। এখানে বেকারত্বের হার প্রায় ৩৬ ভাগ বা কম-বেশী ২ কোটি ৮৫ লাখ ১২ হাজার। ৫ কোটি ৬ লাখ ৮৮ হাজার লোক কর্মরত। ৫ কোটি ৬ লাখ ৮৮ হাজার লোককে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ধরনের চাকরি ও ব্যবসায় বাণিজ্য করে উপরিউক্ত নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। স্বীয় জীবনসহ এই ৫ কোটি ৬ লাখ ৮৮ হাজার লোক ৬ কোটি ৮ লাখ নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ এবং ২ কোটি ৮৫ লাখ ১২ হাজার বেকার লোকের দানা-পানির সংস্থান করে। এই ৫ কোটি ৬ লাখ ৮৮ হাজার লোক নিজেদেরসহ সর্বসাকুল্যে দেশের ১৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করে।

বাংলাদেশের কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তির ওপরে তাদের নিজের জীবনসহ গড়পড়তা প্রায় তিনজন নির্ভরশীল। কর্মরত কোন ব্যক্তি যদি অদক্ষ হয় এবং তার ব্যবসায় বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানে সততা, আন্তরিকতার অভাব থাকে এবং অমনযোগী হয় তাহলে বেকার সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করবে।

আমেরিকাসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে উচ্চ উৎপাদনশীলতার দরুন GDPতে শুধু শতকরা ৮০ ভাগ অবদান রাখে কর্মজীবী জনগোষ্ঠী এবং তাদের Wage Income। শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর কারণে দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকায় বেকার সমস্যার স্বাভাবিক হার হচ্ছে ৭.৫ ভাগ, যা শুধু চাকরি পরিবর্তনের ফলে হয় এবং যা প্রকৃত বেকার সমস্যা নয় (Natural rate of unemployment)। অত্র চিত্রটি উন্নয়নশীল দেশ তথা বাংলাদেশের জন্য বড়ই ভিন্নতর। মানুষ জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে আয়-উপার্জন সাপেক্ষে চাকরি করে। চাকরির যোগ্যতা হিসেবে প্রয়োজন হয় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। কর্মরত মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজন হয় স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থল, অনুকূল পরিবেশ, বন্ধুসুলভ আচরণ, ন্যূনতম বেতন ও উৎসাহ ভাতা ইত্যাদিসহ অনেক কিছু।

Work satisfacton বা সন্তোষজনক কাজের পরিবেশ বলতে শুধু চাকরির নিরাপত্তা নয়, এর সাথে আরো অনেক বিষয় যেমন ন্যূনতম বেতন-ভাতাদি, বাৎসরিক বোনাস, বেতন বৃদ্ধি ও ছুটি ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সুসম্পর্ক বিভিন্নভাবে উৎসাহব্যঞ্জক কার্যকলাপ ইত্যাদিও কর্মক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিবেশের জন্য অত্যাবশ্যক। কর্মক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষাকল্পে নিয়োগদাতা, গ্রহীতা তথা সমগ্র কর্মক্ষেত্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত কর্মস্থলে কাজে ফাঁকি দেয়া, কাজ না করে বেতন-ভাতাদি নেয়া, যথাসময়ে অফিসে না আসা ইত্যাদি অপসংস্কৃতির বিকাশ না ঘটায় কর্মস্থলের পরিবেশ রাজনীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকবে।

Job Security বা চাকরির নিরাপত্তার বিধান আছে শুধুমাত্র মানবিক কারণে। কর্মসংস্থানের কর্তৃপক্ষ ও শ্রমজীবী ব্যক্তিবর্গ সবাই মানুষ। মানুষ ও সামাজিক জীব হিসেবে সবারই ন্যূনতম আত্মমর্যাদা রয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব এই মানুষ এবং মানুষের জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে চাকরির নিরাপত্তা, ভাল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতা ইত্যাদি দরকার। মানবিক কারণে চাকরির নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সাথে মানবিক আচার-আচরণ করবে। ন্যূনতম বেতন-ভাতাদি উৎসাহ-উদ্দীপনা, বেতন বৃদ্ধি, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ও চাকরির নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার নিয়োগদাতা কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার প্রতি চাকরিজীবীদেরও মানবিক হতে হবে। চাকরিতে তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। অফিসের নিয়মনীতি মেনে কাজ করতে হবে। অনুপস্থিত থেকে বেতন নেয়া ও চাকরি রক্ষার অপপ্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়গুলো কর্মজীবীদের মানবিকতার চিহ্ন বহন করে না। স্বাভাবিক নিয়মে কর্তৃপক্ষের প্রতি কর্মজীবীদের আনুগত্য থাকতে হবে। দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুনাম করে সংস্থার উন্নয়ন সাপেক্ষে সহায়ক হতে হবে।

বাস্তবে আমরা অনেকটা ভিন্নরূপ দেখতে পাই। Job Security বা চাকরির নিরাপত্তার উপমহাদেশগুলো যেমন ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকা সামগ্রিকভাবে গরীব। এইসব উপমহাদেশে বিশ্বের অতিদরিদ্র দেশগুলোর অবস্থান। অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো মোটামুটিভাবে উন্নত দেশের আওতায় পড়ে। এসব দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হল বেসরকারী খাত এবং বেসরকারীভাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। একদিকে যেমন বেসরকারী খাত এবং ব্যক্তি মালিকানায় গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতা অনেক বেশী, অন্যদিকে চাকরির নিরাপত্তা বিধান প্রদানকারী উপরে উল্লেখিত গরীব দেশের তুলনায় খুবই কম। দেখা যাচ্ছে Job Security উন্নয়নের সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হচ্ছে। তাই উন্নয়নের স্বার্থে Job Security মানবিক হলেও উৎপাদনশীলতার প্রেক্ষিতে কোন অনুকূল বিষয় নয়। চাকরির নিরাপত্তাহীনতা সাময়িকভাবে শ্রমিকদের জন্য অমানবিক হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দেশের আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি, বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি, আয়ের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ও কর্মজীবীরা বেশী করে উপকৃত হয়।

মানুষ জন্মগতভাবে স্বার্থপর। কর্মক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলে মানুষ কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থপরতাকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করে। ফলে মানুষ কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিবর্তে যথাযথভাবে কাজ না করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজকে বেশী নিয়োজিত রাখে। সংক্ষেপে বলা যায়, People do not want to work. It is the management to make them work। চাকরির নিরাপত্তা বিধানের ফলে জবাবদিহিতা কমে যায় এবং কর্মক্ষেত্র দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানবিক ও সামাজিক নৈতিকতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। তাই Hire and fire economies do better in the world of economic activity than the economy of job security। আবার উল্লেখ্য, চাকরির নিরাপত্তা বিধান না করে দেশের তাৎপর্যপূর্ণ আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারলে সরকারের Tax-income বৃদ্ধি পায়, কর্মজীবীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং আয়ের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হয়। তাই দেশের সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবীদের বৃহত্তর স্বার্থে চাকরির নিরাপত্তা বিধানের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল পশ্চিমা দেশ ও জাপানের মডেল অনুসরণ করে শ্রমজীবীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। চাকরির নিরাপত্তা বিধানের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে শ্রমজীবীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং পরোক্ষভাবে কর্মজীবীদের বেতন-ভাতা অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবসম্মত নিরাপত্তা বিধান করা এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা।

*লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি*